কিংকরদা

লীনা ঘোষ

১৯৬১ সালে শান্তিনিকেতন পাঠভবনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাকে আর আমার দিদি এনাকে অষ্টম শ্রেনীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। তখন বুঝতে পারিনি কোথায় আমি পড়তে এলাম। মন খুব খারাপ। দ্বিতীয় শ্রেনীতে বয়স তখন খুবই কম। মা, বাবাকে ছেড়ে থাকাটা তখন খুবই বেদনাদায়ক ছিল। কি রকম ব্যক্তিত্বরা এখানে থাকেন, তাও বুঝতে পারিনি বোঝার বয়সও তখন হয়নি। বাড়ী ছেড়ে পড়তে যাচ্ছি সেটাই ছিল সবচেয়ে আমার বড় কষ্ট। থাকতে থাকতে ক্রমশ জায়গাটা ভালো লাগতে শুরু করল বন্ধুদের সঙ্গ আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দিল। তারপর একদিন দেখলাম শান্তিনিকেতন আমার জীবনেরই একটা অংশ হয়ে গেছে আস্তে আস্তে শান্তিনিকেতনের সমস্ত মহান ব্যক্তি ত্বদের চিনতে শিখলাম। কিন্তু সেই চেনা তখন সেই বয়সে একদমই মহান হিসেবে নয়। আর সবাই আমরা যেমন আছি সেইভাবে। সেজন্যই বোধ হয় তাঁদেরখুব কাছে যেতে পেরেছিলাম। কোনোই সংকোচ ছিল না মনে। এইভাবে একজন সাধারন ব্যক্তিত্ব হিসেবেই কিংকরদাকে চিনলাম। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। কিংকরদাকে দেওয়া হল আমাদের ক্লাস নিতে। প্রথম দিন ক্লাসে গিয়ে (সেদিন ঠিক সময়ে ক্লাস নিতে এসেছিলেন) ছবি আঁকার টিচার কে দেখে একদম ভাল লাগেনি। এ কেমন টিচার, পাগল পাগল মতন। কি আর করি, ক্লাস করতেই হবে। প্রথম দিন শুধুই কথা আর গল্প। এখানে বলে রাখি, আমাদের ছবি আঁকার ক্লাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর ছিল। কিন্তু কিংকরদা কোনদিনই ঘরে ক্লাস নেননি। এখন যেখানে বিড়লা এবং গোয়েঙ্কা হস্টেল, তখন সেখানে সবে বিড়লা হস্টেল শুরু হয়েছে। আর গোয়েঙ্কা হস্টেলের জায়গায় শুধুই জামবন। কিংকরদা সেই জামবনে বসে ক্লাস নিতেন। আমাদের সময় সকাল পাঁচটায় পিরিয়ড শুরু হত। তারপর দুপুরের খাওয়ার পরে তিনটে পিরিয়েড হত। সেই তিনটে পিরিয়েডের দ্বিতীয় পিরিয়েডই কিংকরদার ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আমরা সময় মত ক্লাসে গিয়ে বসতাম। কিন্তু কংকরদা কোনদিনই সময়মত আসতেন না। দেরিতে এলে কিন্তু কখন ও তাড়াতাড়ি ছাড়তেন না। সময় চলে যেত, ক্লাসে তৃতীয় পিরিয়েড গিয়ে বিকেলেরজলখাবারের সময় এসে যেত। তবুও ছাড়া পেতাম না। অনেকঝগড়া করে তবে ছাড়া পেতাম। কিংকরদা কিন্তু হাসি মুখে ঝগড়া শুনতেন, উপভোগ করতেন। এখন মনে হয়, স্কুলের মেয়েদের ঝগড়া শুনতে বোধ হয় গালো লাগত ওনার। আমাদেরকিন্তু একদম ভালো লাগত না। একটুও ভালো লাগতনা। তার একটা বড় কারণ ছিল, এরকম পাগলের মতন লোকের কাছে ছবি আঁকার ক্লাসে করতে ভালো লাগে না। আরও একটা কারণ ছিল। বিকেলে জল খাবারের পরে আমাদের সাঁতারের ক্লাস থাকত। সাঁতারের ক্লাস আমাদের কাছে আসম্ভব ভালোবাসার বিষয় ছিল। কিন্তু আমরা সেই ক্লাসে প্রায় যেতে পারতাম না। যাওয়ার সময় হত না। তখন কত রাগ করেছি কিংকরদার উপরে। যখন ক্লাস নিতেন, তখন কিংকরদা অসম্ভব গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন একদিন। একদিন আমাদের গ্রামের দৃশ্য আঁকতে দিয়েছেন। আমরা ছোটরা নিজের মতন করে এঁকেছিলাম। খুব পরিষ্কার মনে আছে, আমি গ্রামের দৃশ্য আঁকতে গিয়ে আমার চোখে দেখা গোয়ালপাড়া এঁকেছিলাম। গ্রামে যা যা থাকে যেমন কুঁড়েঘর, গরুর গাড়ি, ধানক্ষেত, ধানের গোলা, পুকুর আরও নানান কিছুতে আমার ড্রইং খাতার ছোট কাগজটা অজস্র বিষয়ে ভর্তি। ভেবেছিলাম, কিংকরদা বোধহয় খুব খুশি হবেন। আমার ছবিটা দেখে বলেছিলেন, আকাশের মতন জায়গা তোমাকে দেওয়া হবে না।

এই একটা ছোট কাগজেই তোমাকে বিষয়টা বোঝাতে হবে। এখন গ্রামের দৃশ্য বলতে যদি সব এঁকে ফেল, তাহলে তো ছবিটা বিষয়ের জঙ্গল হয়ে যাবে। গ্রামের দৃশ্য বোঝাবে, সেটা তোমাকেই বেছে নিতে হবে। সেই শিক্ষা আজও আমার মধ্যে কাজ করে। কিংকরদা কখনও হাতে ধরে ছবি আঁকা শেখাতেন না। আমাদের সঙ্গে নিজেও কাজ করতেন। আমরা আমাদের ছবি আঁকা শেষ করে দেখাতাম। উনি ওনার মতামতটা বলতেন। যেভাবে বলতেন, তাতেই আমাদের শেখা হয়েযেত। এইভাবেই রাগ, অভিমান করতে করতে দেখলাম কখন আমরা অষ্টম শ্রেণীতে উঠে গেছি। মাঝে মাছে ভাবতাম আমাদের অধ্যক্ষকে গিয়ে বলব যে কিংকরদার কাছে আমরা কিছুতেই ক্লাস করব না। আমাদের টিচার পাল্টে দিন। কিন্তু কোনদিনই আমাদের আর অধ্যক্ষর কাছে যাওয়া হয়নি। কেন যাওয়া হয়নি, তারও একটা বড় কারণ হল ঐ চার বছরেদেখলাম কিংকরদার সঙ্গে আমাদের অদ্ভুত সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রাগের, ঝগড়া করার, গল্প করার এই সবমিলিয়ে একটা সুন্দর সম্পর্ক। তখন স্কুলে পড়ার বুদ্ধি নিয়ে কিংকরদাকে দেখেছি। সেই জন্যই বোধহয় সম্পর্কটা অত স্বাভাবিক ছিল। তখন ক্লাসের বাইরে কিংকরদাকে নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটত। কিন্তু আজ যদি (যা আমার মনে আছে) সবলিখতে বসি তাহলে এই লেখা বৃহৎ আকার ধারণ করবে। সেই সময় কিংকরদা বিড়লা হোস্টেলের সামনে ফোয়ারার আকারে একটি মূর্ত্তি তৈরি করছিলেন। আমাদের ছোটদের বিষয়টি নিয়েই ছিল সবচেয়ে বড় আপত্তি। বিষয়টা ছিল তিনটি মোষ যাদের শরীরের আকার মাছের মতন, মুখটি মোষের মতন। খুবই তৃষ্ণার্ত। ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে আর তারালম্বা জিভ বার করে জল খাবার চেষ্টা করেছে।

এখানে বলে রাখি, পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় সোমনাথদার কাছে কিংকরদার এই মূর্তি গড়ার ব্যাপারে শুনেছি যে প্রথমে কিংকরদা দুটো মেয়ের মূর্তি গড়েন। কিন্তু তখনকার উপাচার্যর (শ্রদ্ধেয় সুধিরঞ্জন দাস, আমাদের আদরের সুধিদাদু) এইমেয়েমূর্তি দুটি সম্পর্কে কিছু আপত্তি ছিল। উনি বলেছিলেন মেয়েমূর্তি দুটি চলবে না। বোধহয় ন্যুডমূর্তি দুটি ওনারসেরকম পছন্দ হয় নি। কিংকরদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন তাহলে দুটো মোষ বানিয়ে দি। এবং উপাচার্যেরও সেটা ভালো লেগে যায়। দুই বৃহৎ ব্যক্তিত্বের কিন্তু কোনই সংঘাত দেখা দেয়নি। সেটা নিশ্চয়ই দুজনের বৃহদাকার মন ও ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভব হয়নি।

আমাদের কিন্তু একদম ভালো লাগে নি। দুপুরবেলা যখন কাজ করতেন, আমরা গিয়ে বসতাম। পাশেই আমাদের শ্রীসদন হস্টেল। সুতরাং সহজেই চলে যেতাম। অবসর সময় আমরা কখনই হস্টেলে থাকতাম না। মাঠে-ঘাটে-বনেজ ঙ্গলে ঘুরেবেড়াতাম। হস্টেলের পাশেই জামবন। সুতরাং আমাদের অনেকটা সময় ঐ জামবনেই কাটত। কিচেন থেকে নুন, লঙ্কা নিয়ে এসে জাম গাছের তলায় বসে জাম মেখে খাওয়াটা আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। জামবনের মধ্যে ছিল বুদ্ধের মূর্তি। দূরে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় ছিল কিংকরদার তৈরী পায়েসের বাটি মাথায় নিয়ে সুজাতার মূর্তি। আমরা জাম পেরে কিছুটা বুদ্ধের কোলে রাখতাম। কিছুটা এনে বড় সেগুন পাতার উপরে নুন, লঙ্কা দিয়ে মেখে কিংকরদাকে বাধ্য করতাম খেতে আর আমরাও খেতাম। কিংকরদা মাথায় একটা তাল পাতার টোকা পরে কাজ করতেন। ওনার কাজের

জন্য ওখানে একটা বড় চৌবাচ্চা করা হয়েছিল। তার উপরে একটা সাঁকো ছিল। আমরা জাম খেতাম আর সাকোর উপর থেকে ঝাঁপাতাম। কিংকরদা কাজ বন্ধ করে বসে বসে দেখতেন। কিংকরদাকে বলতাম, কিযে সব আজে বাজে কাজকরছেন তার ঠিক নেই। অর্ধেকটা মাছ, অর্ধেকটা মোষ। খুব খারাপ হচ্ছে। একটা সুন্দর দেখে মেয়ের মূর্তি করনা। এসব আজে বাজে কাজ আর করতে হবে না। তারথেকে ভালো আমাদের সঙ্গে বসে জাম খান। আমার খুব ভালো মনে আছে কিংকরদা টোকাটা মাথায় নিয়ে লম্বা পাছড়িয়ে বসে তাঁর অসাধারণ উদাত্ত গলায় গান গাইতেন আর আমাদের সঙ্গে জাম মাখা খেতেন। কিন্তু ওনার কাজ সম্পর্কে যে আমাদের আপত্তি, সেটা মিটমিট হেসে উপভোগ করতেন। এইভাবে কিংকরদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল।

মাস্টারমশাইকে (শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বোস) তাঁর জন্মসন্দিনে আমাদের ছোটদের প্রণাম করতে যেতে হত। একটা গান শোনাতে হত। তারপর বেবিদি (মাস্টার মশাইয়ের পুত্রবধূ) আমাদের মিষ্টি খেতে দিতেন। আমাদের ঐ বয়সে প্রণাম করতে যাওয়াটা ছিল শুধু মিষ্টি খাওয়ার লোভে। এসব ভাবতেই শিহরন জাগে যে মাস্টারমশাইয়ের মতন ব্যক্তিত্বের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এটা তো আমার জীবনের পরম পাওয়া। মাস্টারমশাই কিন্তু আমাদের বসিয়ে কিংকরদার ক্লাসের কথা খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। বিরক্ত হতাম। বসে থাকতে ইচ্ছা করত না । উপায় নেই। গুরুজনদের অশ্রদ্ধা করার শিক্ষাতো আমরা কখনও পাইনি। সুতরাং বসে বসে সবই বলতাম। কিন্তু কাকে বলছি, সেটা আমাদের কোনই রেখাপাত করত না। পরবর্তীকালে কলাভবনে পড়তে গিয়ে সমস্তই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।